সংকলিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম ভাগ

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট। কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস। ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

নিবেদন

সংকলিতা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। বাংলা ১২৯৩ সালে রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্য প্রকাশিত হয় আর 'ছড়ার ছবি'র প্রকাশকাল ১৩৪২ সাল, প্রায় অর্ধ শতাব্দের ব্যবধান। এই সুদীর্ঘ সময়ে বিষয়বস্তুতে ভাবে ভাষায় ছন্দে কবির রচনায় যে প্রাচুর্য ও যে বৈচিত্র্য প্রকট হইয়াছে তাহার বহু নিদর্শন এই দুখানি সংকলনে একত্র পাওয়া যাইবে; সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের ভাষাজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানের উপযোগী হয়, যুগপৎ আনন্দলাভ ও শিক্ষালাভ হয়, এ লক্ষ্য সর্বদাই সম্মুখে রাখা হইয়াছে। ইতি আশ্বিন ১৩৬১

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

সার্থক জনম

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মা গো,
তোমায় ভালোবেসে।
জানি নে তোর ধন'রতন
আছে কি না রানীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে।
কোন্ বনেতে জানি নে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ
এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে
মুদব নয়ন শেষে।

রাজা ও রানী

এক যে ছিল রাজা
সেদিন আমায় দিল সাজা।
ভোরের রাতে উঠে
আমি গিয়েছিলুম ছুটে,
দেখতে ডালিম গাছে
বনের পির্‌ভু কেমন নাচে।
ডালে ছিলেম চ'ড়ে,
সেটা ভেঙেই গেল প'ড়ে।
সেদিন হ'ল মানা—
আমার পেয়ারা পেড়ে আনা,
রথ দেখতে যাওয়া,
আমার চিঁড়ের পুলি খাওয়া।
কে দিল সেই সাজা,
জানো কে ছিল সেই রাজা ?

এক যে ছিল রানী
আমি তার কথা সব মানি।
সাজার খবর পেয়ে
আমায় দেখল কেবল চেয়ে।

বললে না তো কিছু,
কেবল মুখটি ক'রে নিচু
আপন ঘরে গিয়ে
সেদিন রইল আগল দিয়ে।
হ'ল না তার খাওয়া,
কিম্বা রথ দেখতে যাওয়া।
নিল আমায় কোলে
সাজার সময় সারা হ'লে।
গলা ভাঙা-ভাঙা,
তার চোখ-তুখানি রাঙা।
কে ছিল সেই রানী
আমি জানি জানি জানি।

তাল গাছ

তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।
মনে সাধ কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়,
একেবারে উড়ে যায়—
কোথা পাবে পাখা সে?

তাই তো সে ঠিক তার মাথাতে
গোল গোল পাতাতে
ইচ্ছাটি মেলে তার
মনে মনে ভাবে বুঝি ডানা এই,
উড়ে যেতে মানা নেই
বাসাখানি ফেলে তার।
সারাদিন ঝর্‌ ঝর্‌ থথর
কাঁপে পাতা-পত্তর,
ওড়ে যেন ভাবে ও—
মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে
তারাদের এড়িয়ে
যেন কোথা যাবে ও।
তার পরে হাওয়া যেই নেমে যায়
পাতা-কাঁপা থেমে যায়,
ফেরে তার মনটি—
যেই ভাবে মা যে হয় মাটি তার
ভালো লাগে আরবার
পৃথিবীর কোণটি।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

দিনের আলো নিবে এল, সুয্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে— রঙের উপর রঙ,
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজল ঠঙ ঠঙ।
ও পারেতে বিষ্টি এল, ঝাপসা গাছপালা।
এ পারেতে মেঘের মাথায় একশো মানিক জ্বালা।
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা, কোথায় বা সীমানা।
দেশে দেশে খেলে বেড়ায়, কেউ করে না মানা।
কত নতুন ফুলের বনে বিষ্টি দিয়ে যায়—
পলে পলে নতুন খেলা কোথায় ভেবে পায়?
মেঘের খেলা দেখে কত খেলা পড়ে মনে—
কত দিনের লুকোচুরি কত ঘরের কোণে।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।

মনে পড়ে ঘরটি আলো মায়ের হাসিমুখ,
মনে পড়ে মেঘের ডাকে গুরু-গুরু বুক।
বিছানাটির একটি পাশে ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের 'পরে দৌরাত্মি সে না যায় লেখাজোখা।
ঘরেতে দুরন্ত ছেলে করে দাপাদাপি,
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে— সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।
মনে পড়ে মায়ের মুখে শুনেছিলেম গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।

মনে পড়ে সুয়োরানী দুয়োরানীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা।
মনে পড়ে ঘরের কোণে মিটিমিটি আলো,
চারি দিকের দেয়াল জুড়ে ছায়া কালো কালো।
বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ ঝুপ ঝুপ—
দস্যি ছেলে গল্প শোনে, একেবারে চুপ।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে মেঘলা দিনের গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।

কবে বিষ্টি পড়েছিল, বান এল সে কোথা!
শিব-ঠাকুরের বিয়ে হল, কবেকার সে কথা!
সে দিনও কি এম্‌নিতরো মেঘের ঘটাখানা?
থেকে থেকে বাজ বিজুলি দিচ্ছিল কি হানা?

তিন কন্যে বিয়ে ক'রে কী হল তার শেষে ?
না জানি কোন্ নদীর ধারে, না জানি কোন্ দেশে,
কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে কে গাহিল গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি।
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি।
কী করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই
সকল ছেলে জুটি!

কেয়া-পাতার নৌকো গ'ড়ে সাজিয়ে দেব ফুলে।
তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেব, চলবে দুলে দুলে।
রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু
চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু
চাঁপার বনে লুটি।

উৎসব

দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিম্ ডিম্ রবে
সাঁওতালপল্লীতে উৎসব হবে।
পূর্ণিমাচন্দ্রের জ্যোৎস্নাধারায়
সান্ধ্য বসুন্ধরা তন্দ্রা হারায়।
তাল গাছে তাল গাছে পল্লবচয়
চঞ্চল হিল্লোলে কল্লোলময়।
আম্রের মঞ্জরী গন্ধ বিলায়,
চম্পার সৌরভ শূন্যে মিলায়।
দান করে কুসুমিত কিংশুকবন
সাঁওতাল-কন্যার কর্ণভূষণ।
অতিদূর প্রান্তরে শৈলচূড়ায়
মেঘেরা চীনাংশুক-পতাকা উড়ায়।
ঐ শুনি পথে পথে হৈ হৈ ডাক,
বংশীর সুরে তালে বাজে ঢোল ঢাক।
নন্দিত কণ্ঠের হাস্যের রোল
অম্বরতলে দিল উল্লাসদোল।
ধীরে ধীরে শর্বরী হয় অবসান,
উঠিল বিহঙ্গের প্রত্যুষগান।
বনচূড়া রঞ্জিল স্বর্ণলেখায়
পূর্ব দিগন্তের প্রান্তরেখায়।

পাঁচ বোন

ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির
পাঁচ বোন থাকে কাল্‌নায়,
শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়,
হাঁড়িগুলো রাখে আল্‌নায়।
কোনো দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহা-সিন্দুকে,
টাকাকড়িগুলো হাওয়া খাবে ব'লে
রেখে দেয় খোলা জাল্‌নায়—
নুন দিয়ে তারা ছাঁচিপান সাজে,
চুন দেয় তারা ডাল্‌নায়।

দামোদর শেঠ

অল্পেতে খুশি হবে দামোদব শেঠ কি ?
মুড়কির মোয়া চাই, চাই ভাজা ভেট্‌কি।
আনবে কট্‌কি জুতো, মট্‌কিতে ঘি এনো,
জলপাইগুড়ি থেকে এনো কই জিয়োনো।
চাঁদনিতে পাওয়া যাবে বোয়ালের পেট কি ?

চিনেবাজারের থেকে এনো তো করম্‌চা,
কাঁকড়ার ডিম চাই, চাই যে গরম চা।
নাহয় খরচা হবে, মাথা হবে হেঁট কি?

মনে রেখো, বড়ো মাপে করা চাই আয়োজন—
কলেবর খাটো নয়, তিন মোন প্রায় ওজন।
খোঁজ নিয়ো ঝরিয়াতে জিঁলিপির রেট কী।

ভার

টুন্‌টুনি কহিলেন, 'রে ময়ূর, তোকে
দেখে করুণায় মোর জল আসে চোখে।'
ময়ূর কহিল, 'বটে! কেন, কহো শুনি,
ওগো মহাশয় পক্ষী, ওগো টুন্‌টুনি।'
টুন্‌টুনি কহে, 'এ যে দেখিতে বেয়াড়া,
দেহ তব যত বড়ো পুচ্ছ তারে বাড়া।
আমি দেখো লঘুভারে ফিরি দিন রাত,
তোমার পশ্চাতে পুচ্ছ বিষম উৎপাত।'
ময়ূর কহিল, 'শোক করিয়ো না মিছে—
জেনো ভাই, ভার থাকে গৌরবের পিছে।'

নদী

ওরে　　তোরা কি জানিস কেউ
জলে　　কেন ওঠে এত ঢেউ ?
ওরা　　দিবস-রজনী নাচে,
তাহা　　শিখেছে কাহার কাছে ?
শোন্　　চলচল্ ছলছল্
সদাই　　গাহিয়া চলেছে জল।
ওরা　　কারে ডাকে বাহু তুলে,
ওরা　　কার কোলে ব'সে দুলে ?
সদা　　হেসে করে লুটোপুটি,
চলে　　কোন্‌খানে ছুটোছুটি,
ওরা　　সকলের মন তুষি
আছে　　আপনার মনে খুশি।

আমি　　বসে বসে তাই ভাবি
নদী　　কোথা হতে এল নাবি।
কোথায়　পাহাড় সে কোন্‌খানে,
তাহার　নাম কি কেহই জানে ?
কেহ　　যেতে পারে তার কাছে ?
সেথায়　মানুষ কি কেউ আছে ?

সেথা নাহি তরু, নাহি ঘাস,
নাহি পশুপাখিদের বাস।
সেথা শবদ কিছু না শুনি—
পাহাড় বসে আছে মহামুনি,
তাহার মাথার উপরে শুধু
সাদা বরফ করিছে ধূ ধূ।
সেথা রাশি রাশি মেঘ যত
থাকে ঘরের ছেলের মতো।
শুধু হিমের মতন হাওয়া
সেথায় করে সদা আসা-যাওয়া।
শুধু সারা রাত তারাগুলি
তারে চেয়ে দেখে আঁখি খুলি,
শুধু ভোরের কিরণ এসে
তারে মুকুট পরায় হেসে।

সেই নীল আকাশের পায়ে
সেথা কোমল মেঘের গায়ে
সেথা সাদা বরফের বুকে
নদী ঘুমায় স্বপনসুখে।
কবে মুখে তার রোদ লেগে
নদী আপনি উঠিল জেগে,

কবে	একদা রোদের বেলা
তাহার	মনে পড়ে গেল খেলা।
সেথায়	একা ছিল দিন রাতি,
কেহই	ছিল না খেলার সাথি।
সেথায়	কথা নাহি কারো ঘরে,
সেথায়	গান কেহ নাহি করে।
তাই	ঝুরুঝুরু ঝিরিঝিরি
নদী	বাহিরিল ধীরি ধীরি।
মনে	ভাবিল, যা আছে ভবে
সবই	দেখিয়া লইতে হবে।

নীচে	পাহাড়ের বুক জুড়ে
গাছ	উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে।
তারা	বুড়ো বুড়ো তরু যত,
তাদের	বয়স কে জানে কত!
তাদের	খোপে খোপে গাঁঠে গাঁঠে
পাখি	বাসা বাঁধে কুটো-কাঠে।
তারা	ডাল তুলে কালো কালো
আড়াল	করেছে রবির আলো।
তাদের	শাখায় জটার মতো
ঝুলে	পড়েছে শ্যাওলা যত।

তারা মিলায়ে মিলায়ে কাঁধ
যেন পেতেছে আঁধার-ফাঁদ।
তাদের তলে তলে নিরিবিলি
নদী হেসে চলে খিলিখিলি।
তারে কে পারে রাখিতে ধরে ?
সে যে ছুটোছুটি যায় সরে।
সে যে সদা খেলে লুকোচুরি,
তাহার পায়ে পায়ে বাজে নুড়ি।
পথে শিলা আছে রাশি রাশি,
তাহা ঠেলে চলে হাসি হাসি।
পাহাড় যদি থাকে পথ জুড়ে
নদী হেসে যায় বেঁকেচুরে।
সেথায় বাস করে শিঙ-তোলা
যত বুনো ছাগ দাড়ি-ঝোলা।
সেথায় হরিণ রোঁয়ায় ভরা,
তারা কারেও দেয় না ধরা।
সেথায় মানুষ নূতনতরো,
তাদের শরীর কঠিন বড়ো।
তাদের চোখদুটো নয় সোজা,
তাদের কথা নাহি যায় বোঝা,
তারা পাহাড়ের ছেলে মেয়ে
সদাই কাজ করে গান গেয়ে।

নদী   যত আগে আগে চলে
ততই   সাথি জোটে দলে দলে।
তারা   তারি মতো, ঘর হতে
সবাই   বাহির হয়েছে পথে।
পায়ে   ঠুনুঠুনু বাজে নুড়ি
যেন   বাজিতেছে মল চুড়ি,
গায়ে   আলো করে ঝিকিঝিক্
যেন   পরেছে হীরার চিক।
মুখে   কলকল কত ভাষে
এত   কথা কোথা হতে আসে!
শেষে   সখীতে সখীতে মেলি
হেসে   গায়ে গায়ে পড়ে হেলি।
শেষে   কোলাকুলি কলরবে
তারা   এক হয়ে যায় সবে।
তখন   কলকল ছুটে জল,
কাঁপে   টলমল ধরাতল—
কোথাও   নীচে পড়ে ঝরঝর,
পাথর   কেঁপে ওঠে থরথর;
শিলা   খান খান যায় টুটে,
নদী   চলে পথ কেটে-কুটে।
ধারে   গাছগুলো বড়ো বড়ো,
তারা   হয়ে পড়ে পড়ো-পড়ো।

কত বড়ো পাথরের চাপ
জলে খ'সে পড়ে ঝুপ ঝাপ।
তখন মাটি-গোলা ঘোলা জলে
ফেনা ভেসে যায় দলে দলে।
জলে পাক ঘুরে ঘুরে ওঠে,
যেন পাগলের মতো ছোটে।

শেষে পাহাড় ছাড়িয়ে এসে
নদী পড়ে বাহিরের দেশে।
হেথা যেখানে চাহিয়া দেখে
চোখে সকলি নূতন ঠেকে।
হেথা চারি দিকে খোলা মাঠ,
হেথা সমতল পথ ঘাট।
কোথাও চাষিরা করিছে চাষ;
কোথাও গোরুতে খেতেছে ঘাস;
কোথাও বৃহৎ অশথ গাছে
পাখি শিস দিয়ে দিয়ে নাচে;
কোথাও রাখাল-ছেলের দলে
খেলা করিছে গাছের তলে;
কোথাও নিকটে গ্রামের মাঝে
লোকে ফিরিছে নানান কাজে।

কোথাও বাধা কিছু নাহি পথে,
নদী চলেছে আপন মতে।
পথে বরষার জলধারা
আসে চারি দিক হতে তারা।
নদী দেখিতে দেখিতে বাড়ে,
এখন কে রাখে ধরিয়া তারে!

তাহার দুই কূলে উঠে ঘাস,
সেথায় যত্তেক বকের বাস।
সেথা মহিষের দল থাকে,
তারা লুটায় নদীর পাঁকে।
যত বুনো বরা সেথা ফেরে,
তারা দাঁত দিয়ে মাটি চেরে।
সেথা শেয়াল লুকায়ে থাকে,
রাতে 'হুয়া হুয়া' ক'রে ডাকে।
দেখে এইমতো কত দেশ
কেবা গণিয়া করিবে শেষ?
কোথাও কেবল বালির ডাঙা,
কোথাও মাটিগুলো রাঙা-রাঙা;
কোথাও ধারে ধারে উঠে বেত,
কোথাও দু ধারে গমের খেত;

কোথাও ছোটোখাটো গ্রামখানি,
কোথাও মাথা তোলে রাজধানী—
সেথায় নবাবের বড়ো কোঠা,
তারি পাথরের থাম মোটা,
তারি ঘাটের সোপান যত
জলে নামিয়াছে শত শত।
কোথাও সাদা পাথরের পুলে
নদী বাঁধিয়াছে দুই কূলে।
কোথাও লোহার সাঁকোয় গাড়ি
চলে ধকো ধকো ডাক ছাড়ি।

নদী এইমতো অবশেষে
এল নরম মাটির দেশে।
হেথা যেথায় মোদের বাড়ি
নদী আসিল দুয়ারে তারি।
হেথায় নদী নালা বিল খালে
দেশ ঘিরেছে জলের জালে।
কত মেয়েরা নাহিছে ঘাটে,
কত ছেলেরা সাঁতার কাটে ;
কত জেলেরা ফেলিছে জাল,
কত মাঝিরা ধরেছে হাল ;

সুখে সারিগান গায় দাঁড়ি,
কত খেয়াতরী দেয় পাড়ি।

কোথাও পুরাতন শিবালয়
তীরে সারি সারি জেগে রয়।
সেথায় দু বেলা সকাল-সাঁঝে
পূজার কাঁসর ঘন্টা বাজে।
কত জটাধারী ছাইমাখা
ঘাটে বসে আছে যেন আঁকা।
তীরে কোথাও বসেছে হাট,
নৌকো ভরিয়া রয়েছে ঘাট।
মাঠে কলাই সরিষা ধান,
তাহার কে করিবে পরিমাণ!
কোথাও নিবিড় আখের বনে
শালিক চরিছে আপন-মনে।

কোথাও ধূ ধূ করে বালুচর,
সেথায় গাঙশালিকের ঘর।
সেথায় কাছিম বালির তলে
আপন ডিম পেড়ে আসে চলে।
সেথায় শীতকালে বুনো হাঁস
কত ঝাঁকে ঝাঁকে করে বাস।

সেথায় দলে দলে চখাচখী
করে সারা দিন বকাবকি।
সেথায় কাদাখোঁচা তীরে তীরে
কাদায় খোঁচা দিয়ে দিয়ে ফিরে।

যে দিন পুরনিমা রাতি আসে
চাঁদ আকাশ জুড়িয়া হাসে—
বনে ও পারে আঁধার কালো,
জলে ঝিকিমিকি করে আলো,
বালি চিকিচিকি করে চরে,
ছায়া ঝোপে বসি থাকে ডরে।
সবাই ঘুমায় কুটিরতলে,
তরী একটিও নাহি চলে।
গাছে পাতাটিও নাহি নড়ে,
জলে ঢেউ নাহি ওঠে পড়ে।
কভু ঘুম যদি যায় ছুটে
কোকিল কুহু কুহু গেয়ে উঠে,
কভু ও পারে চরের পাখি
রাতে স্বপনে উঠিছে ডাকি।

নদী চলেছে ডাহিনে বামে,
কভু কোথাও সে নাহি থামে।

হোথায় গহন গভীর বন—
তীরে নাহি লোক, নাহি জন।
শুধু কুমির নদীর ধারে
সুখে রোদ পোহাইছে পাড়ে।
বাঘ ফিরিতেছে ঝোপেঝাপে,
ঘাড়ে পড়ে আসি এক লাফে।
কোথাও দেখা যায় চিতাবাঘ,
তাহার গায়ে চাকা চাকা দাগ ;
রাতে চুপিচুপি আসি ঘাটে
জল চকো চকো করি চাটে।

হেথায় যখন জোয়ার ছোটে
নদী ফুলিয়ে ফুলিয়ে ওঠে।
তখন কানায় কানায় জল—
কত ভেসে আসে ফুল ফল,
ঢেউ হেসে উঠে খলখল,
তরী করি উঠে টলমল।
নদী অজগর-সম ফুলে
গিলে খেতে চায় দুই কূলে।
আবার ক্রমে আসে ভাঁটা পড়ে—
তখন জল যায় সরে সরে,

তখন নদী রোগা হয়ে আসে,
কাদা দেখা দেয় দুই পাশে,
বেরোয় ঘাটের সোপান যত
যেন বুকের হাড়ের মতো।

নদী চলে যায় যত দূরে
ততই জল উঠে পূরে পূরে।
শেষে দেখা নাহি যায় কূল,
চোখে দিক হয়ে যায় ভুল।
নীল হয়ে আসে জলধারা,
মুখে লাগে যেন নুন-পারা।
ক্রমে নীচে নাহি পাই তল,
ক্রমে আকাশে মিশায় জল ;
ডাঙা কোন্‌খানে পড়ে রয়,
শুধু জলে জলে জলময়।

ওরে একি শুনি কোলাহল,
হেরি একি ঘন নীল জল !
ওই বুঝি রে সাগর হোথা—
উহার কিনারা কে জানে কোথা !

ওই লাখো লাখো ঢেউ উঠে
সদাই মরিতেছে মাথা কুটে।
ওঠে সাদা সাদা ফেনা যত
যেন বিষম রাগের মতো।
জল গরজি গরজি ধায়,
যেন আকাশ কাড়িতে চায়।
বায়ু কোথা হতে আসে ছুটে,
ঢেউয়ে হাহা ক'রে পড়ে লুটে।
যেন পাঠশালা-ছাড়া ছেলে
ছুটে লাফায়ে বেড়ায় খেলে।
হেথা যত দূর পানে চাই
কোথাও কিছু নাই, কিছু নাই—
শুধু আকাশ বাতাস জল,
শুধুই কলকল কোলাহল,
শুধু ফেনা আর শুধু ঢেউ—
আর নাহি কিছু, নাহি কেউ।

জলযাত্রা

নৌকো বেঁধে কোথায় গেল, যা ভাই, মাঝি ডাকতে ;
মহেশ-গঞ্জে যেতে হবে শীতের বেলা থাকতে।

পাশের গাঁয়ে ব্যাবসা করে ভাগ্নে আমার বলাই,
তার আড়তে আসব বেচে খেতের নতুন কলাই।
সেখান থেকে বাদুড়-ঘাটা আন্দাজ তিন পোয়া,
যদুঘোষের দোকান থেকে নেব খইয়ের মোয়া।
পেরিয়ে যাব চন্দনীদ' মুন্সিপাড়া দিয়ে ;
মাল্‌সি যাব, পুঁট্‌কি সেথায় থাকে মায়ে ঝিয়ে।
ওদের ঘরে সেরে নেব দুপুর বেলার খাওয়া :
তার পরেতে মেলে যদি পালের যোগ্য হাওয়া
এক পহরে চলে যাব মুখ্‌লুচরের ঘাটে,
যেতে যেতে সন্ধে হবে খড়্‌কেডাঙাব হাটে।
সেথায় থাকে নওয়াপাড়ায় পিসি আমার আপন :
তার বাড়িতে উঠব গিয়ে, করব রাত্রিযাপন।

তিন পহবে শেয়ালগুলো উঠবে যখন ডেকে
ছাড়ব শয়ন ঝাউয়ের মাথায় শুকতারাটি দেখে।
লাগবে আলোর পরশমণি পুব-আকাশের দিকে,
একটু ক'রে আঁধার হবে ফিকে।
বাঁশের বনে একটি-দুটি কাক
দেবে প্রথম ডাক।
সদর-পথের ঐ পারেতে গোঁসাইবাড়ির ছাদ
আড়াল করে নামিয়ে নেবে একাদশীর চাঁদ।
উস্‌খুস্‌ করবে হাওয়া শিরীষ গাছের পাতায়—

রাঙা রঙের ছোঁওয়া দেবে দেউল-চুড়োর মাথায়।
বোষ্টমি সে ঠুনুঠুনু বাজাবে মন্দিরা,
সকাল বেলার কাজ আছে তার নাম শুনিয়ে ফিরা।
ছেলে ছুলে পোষা হাঁসের দল
যেতে যেতে জলের পথে করবে কোলাহল।

আমারও পথ হাঁসের যে পথ, জলের পথে যাত্রী,
ভাসতে যাব ঘাটে ঘাটে ফুরোবে যেই রাত্রি।
সাঁতার কাটব জোয়ার-জলে পৌঁছে উজির-পুরে,
শুকিয়ে নেব ভিজে ধুতি বালিতে রোদ্‌দুরে।
গিয়ে ভজন-ঘাটা
কিনব বেগুন পটোল মুলো, কিনব সজনে ডাঁটা।
পৌঁছব আটবাঁকে,
সূর্য উঠবে মাঝ-গগনে, মহিষ নামবে পাঁকে।
কোকিল-ডাকা বকুল-তলায় রাঁধব আপন হাতে,
কলার পাতায় মেখে নেব গাওয়া ঘি আর ভাতে।
মাখ্‌নাগাঁয়ে পাল নামাবে, বাতাস যাবে থেমে ;
বনঝাউ-ঝোপ রঙিয়ে দিয়ে সূর্য পড়বে নেমে।
বাঁকাদিঘির ঘাটে যাব যখন সন্ধে হবে
গোষ্ঠে-ফেরা ধেনুর হাম্বারবে।
ভেঙে-পড়া ডিঙির মতো হেলে-পড়া দিন
তারা-ভাসা আঁধার-তলায় কোথায় হবে লীন।

সুখদুঃখ

বসেছে আজ রথের তলায়   স্নানযাত্রার মেলা
সকাল থেকে বাদল হল,   ফুরিয়ে এল বেলা।
আজকে দিনের মেলামেশা,
যত খুশি, যতই নেশা,
সবার চেয়ে আনন্দময়
ঐ মেয়েটির হাসি—
এক পয়সায় কিনেছে ও   তালপাতার এক বাঁশি
বাজে বাঁশি, পাতার বাঁশি   আনন্দস্বরে
হাজার লোকের হর্ষধ্বনি   সবার উপরে।

ঠাকুরবাড়ি ঠেলাঠেলি   লোকের নাহি শেষ,
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায়   ভেসে যায় রে দেশ।
আজকে দিনের দুঃখ যত
নাই রে দুঃখ উহার মতো
ঐ যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান-পানে চাহি—
একটি রাঙা লাঠি কিনবে   একটি পয়সা নাহি।
চেয়ে আছে নিমেষহারা   নয়ন অরুণ,
হাজার লোকের মেলাটিরে   করেছে করুণ।

কাঙালিনী

আনন্দময়ীর আগমনে
　　আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হেরো ওই ধনীর দুয়ারে
　　দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশি,
কানে তাই পশিতেছে আসি,
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
　　দুরাশার সুখের স্বপন।
চারি দিকে প্রভাতের আলো
নয়নে লেগেছে বড়ো ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
　　শরতের কনক-তপন।
কত কে যে আসে কত যায়,
কেহ হাসে কেহ গান গায়,
কত বরনের বেশভূষা
　　ঝলকিছে কাঞ্চন-রতন—
কত পরিজন দাস দাসী,
পুষ্পপাতা কত রাশি রাশি—
চোখের উপরে পড়িতেছে
　　মরীচিকা-ছবির মতন।

হেরো তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে।

শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে।
মা'র মায়া পায় নি কখনো,
মা কেমন দেখিতে এসেছে।
তাই বুঝি আঁখি ছলছল,
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা।
চেয়ে যেন মা'র মুখ-পানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে, 'মা গো, এ কেমন ধারা!
এত বাঁশি, এত হাসিরাশি,
এত তোর রতন ভূষণ—
তুই যদি আমার জননী
মোর কেন মলিন বসন!'
ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলি
ভাই-বোন করি গলাগলি
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই।
বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে—

ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়ে,
'আমি তো ওদের কেহ নই।
স্নেহ ক'রে আমার জননী
পরায়ে তো দেয় নি বসন,
প্রভাতে কোলেতে ক'রে নিয়ে
মুছায়ে তো দেয় নি নয়ন।'

আপনার ভাই নেই ব'লে
ওরে কি রে ডাকিবে না কেহ?
আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কি রে করিবে না স্নেহ?
ও কি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে রবে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে!
ওর প্রাণ আঁধার যখন
করুণ শুনায় বড়ো বাঁশি।
দুয়ারেতে সজল নয়ন,
এ বড়ো নিষ্ঠুর হাসিরাশি!
অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব।
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব?

দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,
তবে মিছে সহকারশাখা,
তবে মিছে মঙ্গলকলস।

বীর পুরুষ

মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পাল্কিতে মা চ'ড়ে
দরজাদুটো একটুকু ফাঁক ক'রে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে।

সন্ধে হল, সূর্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়াদিঘির মাঠে।
ধূ ধূ করে যে দিক পানে চাই,
কোনোখানে জনমানব নাই—
তুমি যেন আপন মনে তাই
ভয় পেয়েছ, ভাবছ 'এলেম কোথা'।

আমি বলছি, 'ভয় কোরো না মা গো,
ঐ দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা।'

চোর-কাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে,
মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে।
গোরু বাছুর নেইকো কোনোখানে,
সন্ধে হতেই গেছে গাঁয়ের পানে—
আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে,
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।
তুমি যেন বললে আমায় ডেকে,
'দিঘির ধারে ঐ যে কিসের আলো!'

এমন সময় 'হাঁরে রে-রে রে-রে'
ঐ যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে!
তুমি ভয়ে পাল্কিতে এক কোণে
ঠাকুর দেব্‌তা স্মরণ করছ মনে,
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পাল্কি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো।
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে,
'আমি আছি, ভয় কেন মা করো!'

হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল,
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল।
আমি বলি, 'দাঁড়া, খবরদার!
এক পা কাছে আসিস যদি আর
এই চেয়ে দেখ্ আমার তলোয়ার—
টুকরো করে দেব তোদের সেরে।'
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠল 'হাঁরে রে-রে রে-রে'।

তুমি বললে, 'যাস নে খোকা ওরে!'
আমি বলি, 'দেখো-না চুপ ক'রে।'
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝন্ঝনিয়ে বাজে—
কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।

এত লোকের সঙ্গে লড়াই ক'রে
ভাবছ খোকা গেলই বুঝি ম'রে।
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বলছি এসে, 'লড়াই গেছে থেমে।'

তুমি শুনে পাল্কি থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে—
বলছ, 'ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল !
কী দুর্দশাই হত তা না হলে !'

রোজ কত কী ঘটে যাহা-তাহা—
এমন কেন সত্যি হয় না, আহা !
ঠিক যেন এক গল্প হ'ত তবে,
শুনত যারা অবাক হ'ত সবে—
দাদা বলত, 'কেমন ক'রে হবে,
খোকার গায়ে এত কি জোর আছে ?'
পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে,
'ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে।'

গ্রন্থকীট

পুঁথি-কাটা ওই পোকা
মানুষকে জানে বোকা,
বই কেন সে যে চিবিয়ে খায় না
এই লাগে তার ধোঁকা।

পুতুল ভাঙা

'সাত-আট্টে সাতাশ' আমি   বলেছিলেম ব'লে
গুরুমশায় আমার 'পরে   উঠল রাগে জ্বলে।
মা গো, তুমি পাঁচ পয়সায়   এবার রথের দিনে
সেই-যে রঙিন পুতুলখানি   আপনি দিলে কিনে
খাতার নীচে ছিল ঢাকা ;   দেখালে এক ছেলে,
গুরুমশায় রেগেমেগে   ভেঙে দিলেন ফেলে।
বললেন, 'তোর দিন-রাত্তির   কেবল যত খেলা।
একটুও তোর মন বসে না   পড়াশুনোর বেলা !'

মা গো, আমি জানাই কাকে ?   ওঁর কি গুরু আছে ?
আমি যদি নালিশ করি   এক্‌খনি তাঁর কাছে ?
কোনোরকম খেলার পুতুল   নেই কি মা, ওঁর ঘরে ?
সত্যি কি ওঁর একটুও মন   নেই পুতুলের 'পরে ?
সকাল-সাঁজে তাদের নিয়ে   করতে গিয়ে খেলা
কোনো পড়ায় করেন নি কি   কোনোরকম হেলা ?
ওঁর যদি সেই পুতুল নিয়ে   ভাঙেন কেহ রাগে
বল্‌ দেখি মা, ওঁর মনে তা   কেমনতরো লাগে ?

স্পষ্টভাষী

বসন্ত এসেছে বনে, ফুল ওঠে ফুটি ;
দিন রাত্রি গাহে পিক, নাহি তার ছুটি।
কাক বলে, 'অন্য কাজ নাহি পেলে খুঁজি—
বসন্তের চাটুগান শুরু হল বুঝি ?'
গান বন্ধ করি পিক উঁকি মারি কয়,
'তুমি কোথা হতে এলে, কে গো মহাশয় ?'
'আমি কাক স্পষ্টভাষী' কাক ডাকি বলে।
পিক কয়, 'তুমি ধন্য, নমি পদতলে।
স্পষ্ট ভাষা তব কণ্ঠে থাক্ বারো মাস,
মোর থাক্ মিষ্ট ভাষা আর সত্য ভাষ।'

গুণজ্ঞ

'আমি প্রজাপতি ফিরি রঙিন পাখায়,
কবি তো আমার পানে তবু না তাকায়।
বুঝিতে না পারি আমি, বলো তো ভ্রমর,
কোন্ গুণে কাব্যে তুমি হয়েছ অমর।'
অলি কহে, 'আপনি সুন্দর তুমি বটে,
সুন্দরের গুণ তব মুখে নাহি রটে।
আমি ভাই, মধু খেয়ে গুণ গেয়ে ঘুরি,
কবি আর ফুলের হৃদয় করি চুরি।'

দুই পাখি

খাঁচাব পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে।
বনের পাখি বলে, 'খাঁচাব পাখি ভাই,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।'
খাঁচার পাখি বলে, 'বনের পাখি, আয়
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।'
বনের পাখি বলে, 'না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব!'

বনের পাখি গাহে বাহিরে বসি বসি
বনের গান ছিল যত,
খাঁচার পাখি পড়ে শিখানো বুলি তার;
দোঁহার ভাষা দুইমতো।
বনের পাখি বলে, 'খাঁচার পাখি ভাই,
বনের গান গাও দিখি।'
খাঁচার পাখি বলে, 'বনের পাখি ভাই,
খাঁচার গান লহো শিখি।'

বনের পাখি বলে, 'না,
আমি শিখানো গান নাহি চাই।'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায়,
আমি কেমনে বনগান গাই!'

বনের পাখি বলে, 'আকাশ ঘননীল,
কোথাও বাধা নাহি তার।'
খাঁচার পাখি বলে, 'খাঁচাটি পরিপাটি
কেমন ঢাকা চারি ধার!'
বনের পাখি বলে, 'আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।'
খাঁচার পাখি বলে, 'নিরালা সুখকোণে
বাঁধিয়া রাখো আপনারে।'
বনের পাখি বলে, 'না,
সেথা কোথায় উড়িবারে পাই?'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায়
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই?'

এমনি দুই পাখি দোঁহারে ভালোবাসে,
তবুও কাছে নাহি পায়।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে,
নীরবে চোখে চোখে চায়।

দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে,
বুঝাতে নারে আপনায়।
দুজনে একা একা ঝাপটি মরে পাখা,
কাতরে কহে, 'কাছে আয়।'
বনের পাখি বলে, 'না,
কবে খাঁচায় রুধি দিবে দ্বার।'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায়,
মোর শকতি নাহি উড়িবার।'

দুই বিঘা জমি

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবি গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, 'বুঝেছ উপেন ? এ জমি লইব কিনে।'
কহিলাম আমি, 'তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই।
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো-জোর মরিবার মতো ঠাঁই।'
শুনি রাজা কহে, 'বাপু, জান তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা।—
ওটা দিতে হবে।' কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজলচক্ষে, 'করুন রক্ষে গরিবের ভিটেখানি।
সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!'

আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে ;
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।'

পরে মাস-দেড়ে ভিটেমাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রি, সকলি বিক্রি মিথ্যা দেনাব খতে।
এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
মনে ভাবিলাম, মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে।
তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু বিঘার পরিবর্তে,
সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য—
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি,
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে সেই দুই বিঘা জমি।
হাটে মাঠে বাটে এই মতো কাটে বছর পনেরো-ষোলো,
এক দিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়োই বাসনা হল।

নমোনমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি—
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি—
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ—
স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল, নিশীথশীতল স্নেহ।

বুক-ভরা মধু, বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে—
'মা' বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।
দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে,
কুমোরের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি, রথতলা করি বামে—
রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে।

বিদীর্ণ-হিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারি দিকে চেয়ে দেখি
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে সেই আমগাছ, একি!
বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালক-কালের কথা।
সেই মনে পড়ে, জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম—
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম:
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন—
ভাবিলাম হায়, আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন!
সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে;
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।
ভাবিলাম মনে, বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা—
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা।

হেনকালে হায়, যমদূত-প্রায় কোথা হতে এল মালী,
ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।

কহিলাম তবে, 'আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব—
দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব !'
চিনিল না মোরে, নিয়ে গেল ধরে কাঁধে তুলি লাঠিগাছ ;
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ-সাথে ধরিতেছিলেন মাছ।
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, 'মারিয়া করিব খুন।'
বাবু যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ।
আমি কহিলাম, 'শুধু দুটি আম ভিখ মাগি, মহাশয়।'
বাবু কহে হেসে, 'বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।'
আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে !
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে !

নকল গড়

'জলস্পর্শ করব না আর' চিতোর-রানার পণ,
'বুঁদির কেল্লা মাটির 'পরে থাকবে যত ক্ষণ।'
'কী প্রতিজ্ঞা হায় মহারাজ,
মানুষের যা অসাধ্য কাজ
কেমন করে সাধবে তা আজ' কহেন মন্ত্রীগণ।
কহেন রাজা, 'সাধ্য না হয় সাধব আমার পণ।'

বুঁদির কেল্লা চিতোর হতে যোজন-তিনেক দূর।
সেথায় হারাবংশী সবাই মহা মহা শূর।

হামু রাজা দিচ্ছে থানা,
ভয় কারে কয় নাইকো জানা—
তাহার সত্য প্রমাণ রানা পেয়েছেন প্রচুর।
হারাবংশীর কেল্লা বুঁদি যোজন-তিনেক দূর।

মন্ত্রী কহে যুক্তি করি, 'আজকে সারা রাতি
মাটি দিয়ে বুঁদির মতো নকল কেল্লা পাতি।
রাজা এসে আপন করে
দিবেন ভেঙে ধূলির 'পরে,
নইলে শুধু কথার তরে হবেন আত্মঘাতী!'
মন্ত্রী দিল চিতোর-মাঝে নকল কেল্লা পাতি।

কুম্ভ ছিল রানার ভৃত্য হারাবংশী বীর—
হরিণ মেরে আসছে ফিরে, স্কন্ধে ধনু তীর।
খবর পেয়ে কহে, 'কে রে
নকল বুঁদি কেল্লা মেরে
হারাবংশী রাজপুতেরে করবে নতশির?
নকল বুঁদি রাখব আমি হারাবংশী বীর।'

মাটির কেল্লা ভাঙতে আসেন রানা মহারাজ।
'দূরে রহো' কহে কুম্ভ— গর্জে যেন বাজ।

'বুঁদির নামে করবে খেলা,
সইব না সে অবহেলা—
নকল গড়ের মাটির ঢেলা রাখব আমি আজ।'
কহে কুম্ভ, 'দূরে রহো, রানা মহারাজ।'

ভূমির 'পরে জানু পাতি তুলি ধনুঃশর
একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদিগড়।
রানার সেনা ঘিরি তারে
মুণ্ড কাটে তরবারে—
খেলাগড়ের সিংহদ্বারে পড়ল ভূমি-'পর,
রক্তে তাহার ধন্য হল নকল বুঁদিগড়।

প্রার্থনাতীত দান

শিখের পক্ষে বেণীচ্ছেদন ধর্মপরিত্যাগের ন্যায় দূষণীয়

পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল
বন্দী শিখের দল—
সুহিদ্‌গঞ্জে রক্তবরন
হইল ধরণীতল।

নবাব কহিল, 'শুন তরুসিং,
তোমারে ক্ষমিতে চাই।'

তরুসিং কহে, 'মোরে কেন তব
এত অবহেলা ভাই ?'
নবাব কহিল, 'মহাবীর তুমি,
তোমারে না করি ক্রোধ ;
বেণীটি কাটিয়া দিয়ে যাও মোরে,
এই শুধু অনুরোধ।'
তরুসিং কহে, 'করুণা তোমার
হৃদয়ে রহিল গাঁথা—
যা চেয়েছ তার কিছু বেশি দিব,
বেণীর সঙ্গে মাথা।'

মূল্যপ্রাপ্তি

অঘ্রানে শীতের রাতে নিষ্ঠুর শিশিরঘাতে
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া ;
সুদাস মালীর ঘরে কাননের সরোবরে
একটি ফুটেছে কী করিয়া।
তুলি লয়ে বেচিবারে গেল সে প্রাসাদদ্বারে,
মাগিল রাজার দরশন—
হেনকালে হেরি ফুল আনন্দে পুলকাকুল
পথিক কহিল একজন,

'অকালের পদ্ম তব আমি এটি কিনি লব,
কত মূল্য লইবে ইহার ?
বুদ্ধ ভগবান আজ এসেছেন পুরমাঝ
তাঁর পায়ে দিব উপহার।'
মালী কহে, 'এক মাষা স্বর্ণ পাব মনে আশা।'
পথিক চাহিল তাহা দিতে—
হেনকালে সমারোহে বহু পূজা-অর্ঘ্য ব'হে
নৃপতি বাহিরে আচম্বিতে।

রাজেন্দ্র প্রসেনজিৎ উচ্চারি মঙ্গলগীত
চলেছেন বুদ্ধ-দরশনে—
হেরি অকালের ফুল শুধালেন, 'কত মূল ?
কিনি দিব প্রভুর চরণে।'
মালী কহে, 'হে রাজন, স্বর্ণমাষা দিয়ে পণ
কিনিছেন এই মহাশয়।'
'দশ মাষা দিব আমি' কহিলা ধরণীস্বামী ;
'বিশ মাষা দিব' পান্থ কয়।
দোঁহে কহে 'দেহো দেহো', হার নাহি মানে কেহ ;
মূল্য বেড়ে ওঠে ক্রমাগত।
মালী ভাবে, যার তরে এ দোঁহে বিবাদ করে
তাঁরে দিলে আরো পাব কত !

কহিল সে করজোড়ে, 'দয়া ক'রে ক্ষম মোরে,
এ ফুল বেচিতে নাহি মন।'
এত বলি ছুটিল সে যেথা রয়েছেন বসে
বুদ্ধদেব উজলি কানন।

বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে,
নিরঞ্জন আনন্দমুরতি।
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে, স্ফুরিছে অধর-'পরে
করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি।
সুদাস রহিল চাহি, নয়নে নিমেষ নাহি,
মুখে তার বাক্য নাহি সরে—
সহসা ভূতলে পড়ি পদ্মটি রাখিল ধরি
প্রভুর চরণপদ্ম-'পরে।
বরষি অমৃতরাশি বুদ্ধ শুধালেন হাসি,
'কহো বৎস, কী তব প্রার্থনা।'
ব্যাকুল সুদাস কহে, 'প্রভু, আর কিছু নহে,
চরণের ধূলি এক কণা।'

নগরলক্ষ্মী

দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে
জাগিয়া উঠিল হাহারবে,
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে   শুধালেন জনে জনে,
'ক্ষুধিতেরে অন্নদান-সেবা
তোমরা লইবে বলো কেবা ?'

শুনি তাহা রত্নাকর শেঠ
করিয়া রহিল মাথা হেঁট।
কহিল সে কর জুড়ি,   'ক্ষুধার্ত বিশাল পুরী,
এর ক্ষুধা মিটাইব আমি—
এমন ক্ষমতা নাই স্বামী।'

কহিল সামন্ত জয়সেন,
'যে আদেশ প্রভু করিছেন
তাহা লইতাম শিরে   যদি মোর বুক চিরে
রক্ত দিলে হ'ত কোনো কাজ—
মোর ঘরে অন্ন কোথা আজ ?'

নিশ্বাসিয়া কহে ধর্মপাল,
'কী কব, এমন দগ্ধ ভাল—

আমার সোনার খেত শুষিছে অজন্মা-প্রেত,
রাজকর জোগানো কঠিন।
হয়েছি অক্ষম দীনহীন।'

রহে সবে মুখে মুখে চাহি,
কাহারো উত্তর কিছু নাহি।
নির্বাক্ সে সভাঘরে ব্যথিত নগরী-'পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারাসম রহে ফুটি।

তখন উঠিল ধীরে ধীরে
রক্তভাল লাজনম্রশিরে
অনাথপিণ্ডদসুতা, বেদনায় অশ্রুপ্লুতা,
বুদ্ধের চরণরেণু লয়ে
মধুকণ্ঠে কহিল বিনয়ে—

'ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া
তব আজ্ঞা লইল বহিয়া।
কাঁদে যারা খাদ্যহারা আমার সন্তান তারা ;
নগরীরে অন্ন বিলাবার
আমি আজি লইলাম ভার।'

বিস্ময় মানিল সবে শুনি—
'ভিক্ষুকন্যা তুমি যে ভিক্ষুণী,
কোন্ অহংকারে মাতি লইলে মস্তক পাতি
এ-হেন কঠিন গুরু কাজ ?
কী আছে তোমার কহো আজ।'

কহিল সে নমি সবা-কাছে,
'শুধু এই ভিক্ষাপাত্র আছে।
আমি দীনহীন মেয়ে অক্ষম সবার চেয়ে,
তাই তোমাদের পাব দয়া—
প্রভু-আজ্ঞা হইবে বিজয়া।

আমাব ভাণ্ডার আছে ভ'রে
তোমা-সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে,
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা—
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।'

দেবতার বিদায়

দেবতামন্দির-মাঝে ভকত প্রবীণ
জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধূলিমাখা দেহে
বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন পশিল সে গেহে।

কহিল কাতর কণ্ঠে 'গৃহ মোর নাই,
এক পাশে দয়া ক'রে দেহো মোরে ঠাঁই।'
সসংকোচে ভক্তবর কহিলেন তারে,
'আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যা রে।'

সে কহিল 'চলিলাম'— চক্ষের নিমেষে
ভিখারি ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে 'প্রভু, মোরে কী ছল ছলিলে!'
দেবতা কহিল, 'মোরে দূর করি দিলে।

জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া-তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।'

—